বিবর্তনবাদ বনাম সৃষ্টিতত্ত্বের উপকথা

মূল : ডঃ টিম বেড়া, অনুবাদ : বন্যা আহমেদ

{অনুবাদকের কথাঃ একটা বই যে মানুষের জীবনে কি পরিমান প্রভাব ফেলতে পারে তার প্রমাণ হচ্ছে দেবী প্রসাদ চট্টপাধ্যায়ের 'যে গল্পের শেষ নেই' বইটি। এই বইটি দিয়েই বিজ্ঞানের সাথে আমার প্রথম পরিচিতি। তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। এর পরে আর কোনদিন চারপাশের প্রকৃতি এবং জীবনকে বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুকে গ্রহনযোগ্য বলে মনে করতে পারিনি। জীবনের উৎপত্তি এবং বিকাশ বোঝার জন্য বিবর্তনবাদ (Evolution) ছাড়া আর অন্য কোন ধর্মীয়, অর্ধ-ধর্মীয় ব্যখ্যাই আর মনে দাগ কাটে নি। মানুষের উৎপত্তি নিয়ে কত ধরনের গল্পই না মানুষ বের করেছে, একেক ধর্মগ্রন্থ একেভাবে এই সব ধ্যান ধারণাকে তুলে ধরেছে। আজকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রগতিগুলো সম্পর্কে ধারণা না থাকলে হাজার বছরের কল্পনা প্রসুত অবাস্তব এই ধারনাগুলো থেকে আমরা মুক্তি পাবো কিভাবে?

এবার বহু বছর পর দেশে যেয়ে হতাশ হয়েছি আজিজ সুপার মার্কেটে বইয়ের সেলফগুলো দেখে। পুরানো ভাল বইগুলো তো দুরের কথা, নতুন কোন বিজ্ঞানের ভালো বইও খুজে পাইনি যা সাধারণ মানুষ বা ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ে বুঝতে পারবে। অথচ পৃথিবী কত এগিয়ে গেছে এই ২০-৩০ বছরে। অনুজীবতত্ত্বের (micro-biology) বিভিন্ন আবিষ্কার থেকে শুরু করে মানুষের জিনোমের (Human Genome sequecing) পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করে ফেলা হয়েছে। এবং যতই বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে ততই আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রমানিত হচ্ছে ডারউইনের প্রস্তাবিত বিবর্তনবাদতত্ত্বের যথার্থতা। তখন থেকেই ভাবছি নতুন আবিষ্কারগুলোকে তুলে ধরে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, ইতিহাস এবং সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে খুব সোজা করে কিছু লেখা দরকার। আমি লেখক নই এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সবার লেখক হওয়া উচিত ও নয়, সবার সে যোগ্যতাও নেই। তাই লেখালেখি নিয়ে সব সময়ই একধরনের জড়তা ছিল, হঠাৎ করে বসে কিছু একটা লিখে ফেলব এমনটা কখনই হয়ে ওঠে না। এমন সময় একজন শুভানুধ্যায়ী বললেন এত কষ্ট করে নতুন করে আবার এসব লেখার কি আছে, আমেরিকায়, ইউরোপে বেশ কিছু বিজ্ঞানীর লেখা বই আছে যারা সাধারণ জনগণের কাছে বিবর্তনবাদতত্ত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন খুব সাধারণ ভাষায়, সেই বইগুলো থেকে অনুবাদ করলেই তো হয়। যেমন, ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ টিম বেড়া (Dr. Tim Berra) 'Evolution and the Myth of creationism' নামে একটি চমৎকার বই লিখেছেন সাধারণ পাঠকের জন্য খুব সোজা করে। তিনি মুক্ত-মনাকে তার এই বইটি অনুবাদ করবারও অনুমতি দিয়েছেন। আমার এই লেখাটির উদ্দেশ্য মুলত তার বইয়েরই কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ করা।

চার্লস ডারউইন এবং অ্যলফ্রেড ওয়ালেস বিবর্তনবাদের ধারণাটি প্রস্তাব করেছিলেন আজকে থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে। তারপর পৃথিবী এগিয়ে গেছে অনেক দুর, আর বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে এমনই এক গতিতে যে আজ থেকে দেড়শো বছর আগে তা কল্পনা করাও এক অসাধ্য ব্যাপার ছিল। বিবর্তনবাদ একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব; মাধ্যাকর্ষন তত্ত্ব বা আপেক্ষিক তত্ত্বের মতই বিবর্তনবাদ আজ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। কিন্তু আজও এই তত্ত্বটিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতর্কের সীমা পরিসীমা নেই। বৈজ্ঞানিক সমাজ যুক্তির আলোকে অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একে তত্ত্বের (scientific theory) আসনে জায়গা করে দিলেও রাজনৈতিক-সামাজিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে বিবর্তনবাদ এখনও গ্রহনযোগ্যতা পায়নি। কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বটির পর আর কোন তত্ত্বকে মনে হয় না এত দীর্ঘকাল ধরে সময়ের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই দুটি তত্ত্বই মানুষের হাজার বছর ধরে লালন করা ধর্মীয় এবং সামাজিক চিন্তা

চেতনাকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিয়েছে। আদি থেকে মানুষ যেমন বিশ্বাস করে এসেছে যে পৃথিবী সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু তেমনিভাবে জেনে এসেছে তারা কোন না কোন ধর্মের সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে সৃষ্টি হয়ে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে পৃথিবীতে এসে পড়েছে। হাজার বছরের চিন্তার 'স্ট্যাটাস কো'(status quo) ভেঙ্গে একে এত সহজে মেনে নেওয়া আসলেই একটি কঠিন ব্যাপার। শুধু আমাদের দেশগুলোর মত পশ্চাৎপদ জায়গায় নয়, আমেরিকা ইউরোপের মত বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত দেশগুলোতেও এখনও বেশিরভাগ মানুষের কাছেই বিবর্তনবাদ গ্রহনযোগ্যতা পায়নি। National Geographic ম্যগজিন এর এক সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রায় ৫০% আমেরিকান মনে করে যে বাইবেল এ বর্ণিত উপায়ে সৃষ্টিকর্তা ছয় হাজার আগে মানুষকে এই ভাবেই তৈরী করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলো। প্রায় ৪০% মনে করে সৃষ্টিকর্তা জীবন তৈরী করে পাঠানোর পর বিবর্তনের কোন ভুমিকা থাকলেও থাকতেও পারে।

ডঃ টিম বেড়ার মতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে সক্রিয় এবং সংগঠিতভাবে সাধারণ মানুষকে সৃষ্টিতত্ত্ব গেলানোর চেষ্টা করছে, বৈজ্ঞানিক মহল কিংবা স্কুল কলেজগুলো সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে তুলে ধরার জন্য তার তুলনায় কিছুই করে না। তার উপরে আবার সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে যেহেতু ধর্মকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কোন দেশের সরকার বা প্রচার মাধ্যমও বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলোকে জনগনের সামনে তুলে ধরার চেষ্টাও করে না। ডঃ বেড়া অত্যন্ত সহজ ভাষায়, কঠিন তত্ত্বগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, আমি চেষ্টা করবো তার মধ্যেও সহজতর এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে প্রথমে অনুবাদ করতে যাতে সাধারণ পাঠকের কাছে বিষয়টি একঘেয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মত না শোনায়। তবে প্রথম অধ্যায়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বিবর্তনতত্ত্বের কিছু ব্যাখ্যা অনুবাদ করলাম যাতে কিছু জটিল বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থ বুঝতে কষ্ট না হয়। এর পর ধারাবাহিকভাবে আমাদের নিত্যদিনের জীবনে বিবর্তনের ভুমিকা ও উদাহরণ, ভুতাত্ত্বিক সময় এবং ফসিল রেকর্ড, প্রানের উৎপত্তি ও মানুষের বিবর্তন ইত্যাদি অধ্যায়গুলো অনুবাদ করবো। আনুবাদ করার সময় আমি বেশ কিছু ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে মুল ইংরেজী শব্দটিকেই বাংলায় লিখেছি, যেমন জীন কে বংশগতির একক না বলে জীনই লিখেছি, ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় সব বৈজ্ঞানিক শব্দের অনুবাদ অপ্রয়োজনীয় এবং পড়তেও দুর্বোধ্য লাগে। এব্যাপারে পাঠকেরা যদি ভিন্নমত পোষন করেন তাহলে একটু কষ্ট করে সেটা জানালে বাধিত হব।

বন্যা, জানুয়ারী ১, ২০০৫
e-mail: bonna_ga@yahoo.com }

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) ও বিবর্তনবাদ

১৯৫৮ সালে লন্ডনের লিনিয়ান সোসায়টির এক অধিবেশনে ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) এবং অ্যলফ্রেড ওয়ালেস(১৮২৩-১৯১৩) পৃথক পৃথকভাবে বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি প্রস্তাব করেন। এর আগেও অনেকেই জীবের বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু ডারউইনের প্রস্তাবিত তত্ত্বটিই একমাত্র তত্ত্ব যা কিনা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে টিকে থাকতে পেরেছে।

তারপর, ১৮৫৯ সালে ডারউইন তার বিখ্যাত *On the origin of Species* বইটি প্রকাশ করেন। এই বইটিতে তিনি শুধু বিবর্তনবাদ তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যায় দেননি, সাথে সাথে কিভাবে বিবর্তনের প্রক্রিয়া কাজ করে থাকতে পারে - প্রথমবারের মত তার পদ্ধতিও বর্ণনা করেন। আজকে বিবর্তনবাদকে জীববিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান এবং জীববিদ্যার আন্যান্য বিভিন্ন শাখার 'তাত্ত্বিক ভিত্তিমুল' হিসেবে গন্য করা হয়।

ডারউইন লক্ষ্য করেন যে উদ্ভিত এবং প্রানী উভয়েই যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করে তার অনেকাংশই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। কড মাছ বছরে দশ লাখেরও বেশী ডিম পাড়ে, একটি মেপল গাছে হাজার হাজার ফল ধরে, সমুদ্রে লাখ লাখ লার্ভা ভেসে বেড়ায় যারা পুর্নাঙ্গ রূপ ধারণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করে। প্রকৃতিতে জীবের সমষ্টিগত সংখ্যার তুলনায় তাদের বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা অনেক বেশী। প্রকৃতির এই বাড়তি বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটির আবশ্যই কোন ব্যাখ্যা থাকতে হবে। ডারউইন আরও লক্ষ্য করেন যে, যমজ ছাড়া একটি প্রজাতির প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে সবসময়ই প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। ডারউইন এই পর্যবেক্ষনগুলো থেকে সিধান্তে আসেন যে, প্রকৃতিতে সবসময় খাদ্য, বেচে থাকা, জায়গা, সঙ্গী নির্ধারণ, আশ্রয়, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে একধরনের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। প্রকৃতি উপযুক্তদের (অনুবাদকের নোটঃ এখানে শুধুমাত্র পরিবেশগতভাবে উপযুক্ত বলা হচেছ, Social Darwinism er বহু বিতর্কিত survival of the fittest নয়, ডারউইন মারা যাবার বেশ পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই Social Darwinism নামক ধারণাটি প্রচার করা হয়, পরবর্তীতে বিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা একে ভুল বলে ঘোষনা করেন) টিকিয়ে রাখে, আর অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্তরা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। ডারউইন প্রকৃতির এই বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়াটারই নাম দেন প্রাকৃতিক নির্বাচন বা Natural Selection। এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলশ্রুতিতেই জৈবিক বিবর্তন ঘটতে থাকে, যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'Descent with modification'. প্রায় দেড়শ বছর পরে আজকেও এই ব্যখাটিকে বিবর্তনবাদের সবচেয়ে উপযুক্ত সংজ্ঞা হিসেবে গন্য করা হয়।

ডারউইনের সময় বিজ্ঞানীদের বংশগতি বিদ্যা বা জেনেটিক্স (genetics) সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। ফসিল বা জীবাশ্ম বিদ্যা (Paleontology) বা ফসিল রেকর্ডও তখন তেমন জোড়দারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আজকে আমরা ফসিলবিদ্যা এবং জেনেটিক্স এর বিভিন্ন আবিষ্কার থেকে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। ভাবতেও অবাক লাগে ডারউইন কিভাবে এই সব জ্ঞান ছাড়াই বিবর্তনবাদ সম্পর্কে এত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হয়েছিলেন!

আজকে বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রসরতার কারণে আমরা বিবর্তনবাদকে জেনেটিক্সের আলোকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারি। জীবন সংগ্রামে যে সব পরিবৃত্তি বা variation জীবকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বেচে থাকতে বেশী সুবিধা করে দেয় সেই সব জীবই বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে এবং যারা পরিবেশের সাথে কম খাপ খাওয়াতে পারে তাদের তুলনায় তারা অনেক বেশী সন্তান রেখে যেতে সক্ষম হয়। তার ফলে বেশী উপযুক্তদের জীন অনেক বেশী পরিমানে প্রবাহিত হয় তাদের সন্তানদের মধ্যে। জেনেটিক পরিবৃত্তির (genetic variation) এই প্রভেদমুলক প্রজননই (differential reproduction) হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা। এর ফলে সময়ের সাথে সাথে একটি জীবের জনসংখ্যায় জীনের (Gene বা বংশগতির একক) ফ্রিকোয়েন্সি বদলাতে থাকে - পরবর্তী প্রজন্মে কিছু জীন বেশী প্রবাহিত হয় আর কিছু জীনের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিবর্তন ঘটতে থাকাকেই বিবর্তন বলে। অর্থাৎ জেনেটিক্সের সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন

প্রজাতির জনসংখ্যায় জীন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনই হচ্ছে বিবর্তন। এই পরিবৃত্তি বা variation গুলো যৌন প্রজনন, মিউটেশন (Mutation) এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটতে পারে। পরিবেশ এখানে নির্বাচনি শক্তি (Selection agent) হিসেবে কাজ করে, এবং যেহেতু সময় এবং অঞ্চল বিশেষে পরিবেশ বদলে যায় তাই বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পরিবৃত্তি নির্বিচিত হয়। সেইজন্যই আমরা একেক সময়ে একেক অঞ্চলে একেক রকমের জীব দেখতে পাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিবর্তনের উদাহরণ

একঝাক পাখী উড়ে যেতে দেখে আমাদের মনে হতেই পারে যে প্রত্যেকটি পাখী এক্কেবারে একইরকম। কিন্তু একটু খুটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে আকারে, ব্যবহারে, মাপে হাজারো রকমের ছোট ছোট পার্থক্য রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এই মাইক্রো-বিবর্তনের পার্থক্যগুলো জীন পুলের (gene pool) এর মধ্যে জমা হতে থাকে। এর মধ্যে আবার কোন কোন জীব বংশ বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয় বলে এইসব বৈশিষ্টের কিছু হারিয়েও যায়; তবে এদের বেশীর ভাগই বংশপরম্পরায় টিকে থাকে এবং জীবের জনসংখ্যার মধ্যে কম বা বেশী প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কোন প্রজাতির একটি অংশ যখন ভৌগলিকভাবে কোন একটি জায়গায় আলাদা (isolated) হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্টগত পার্থক্যগুলো ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে। জীন পুলের বংশগত বৈশিষ্টগুলোর উপর প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া কাজ করার ফলে একসময় যথেষ্ট পরিমাণে পার্থক্য তৈরী হয়। এই পার্থক্যগুলো বাড়তে বাড়তে এক সময় এমন অবস্থায় পৌছায় যে এই সীমিত সংখ্যক আলাদা হয়ে যাওয়া প্রানীগুলো এক নতুন প্রজাতিতে পরিনত হয় এবং আলাদা হয়ে যাওয়ার আগের স্বজাতীয় প্রানীগুলোর সাথে তাদের অন্তঃপ্রজনন অসম্ভব হয়ে দাড়ায়; যা এতদিন ছিল একই প্রজাতির দুটি আলাদা হয়ে যাওয়া অংশ তা এখন সম্পুর্ন দুটি আলাদা প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এই রকম অবস্থা থেকেই ঘটে ম্যাক্রো-বিবর্তনীয় পরিবর্তন। এই পুরানো এবং নতুন প্রজাতির উপর তার পারিপার্শ্বিকতা এবং জীন পুলের প্রভাবের উপর নির্ভর করবে এক্ষেত্রে এক নতুন লাইনের বিবর্তন ঘটবে কি ঘটবে না। ঘোড়ার বিবর্তন এবং সরীসৃপ থেকে পাখীর বিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা এই একই প্রক্রিয়া দেখতে পাই। একটি নির্দিষ্ট বিবর্তন প্রক্রিয়া ঘটতে কত সময় লাগবে সেটা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর, যেমন, একটি প্রজাতির প্রজন্মের সময়সীমা, বংশবৃদ্ধির হার, পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন ইত্যাদি; এটা যেমন একদশকেও ঘটতে পারে আবার শত, সহস্র বা লক্ষ বছরও লেগে যেতে পারে। আমাদের সামনে অহরহ ঘটতে থাকা কিছু ঘটনার মধ্য দিয়েই মাইক্রো-বিবর্তনের ব্যাখা দেওয়া সম্ভব। এখানে এরকম কতগুলো উদাহরন আলোচনা করার পর আমি পরবর্তী অধ্যায়ে জীবনের উদ্ভব এবং বিকাশের জটিল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

ব্যকটেরিয়ার অ্যন্টিবায়োটিক প্রতিরোধের ক্ষমতাঃ কেন ডাক্তাররা রোগীকে ওষুধের ডোজ শেষ করতে বলেন?

একজন ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার সময় রোগীকে ওষুধের সবকটি ডোজ শেষ করতে বলে দেন এবং সতর্ক করে দেন যেন তিন চার দিন পর একটু ভালো লাগলেই ওষুধ খাওয়া ছেড়ে না দেয়। বিবর্তনবিদ্যা থেকে শেখা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই ডাক্তাররা এই উপদেশ দিয়ে থাকেন। তিন চার দিনের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকটি শরীরের ভিতরের বেশীরভাগ ব্যকটেরিয়া মেরে ফেলে বলেই আমরা এত তাড়াতাড়ি সুস্থ বোধ করতে থাকি। এখন যদি হঠাৎ করে কেউ ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী এবং অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অনেক বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বাকী ব্যকটেরিয়াগুলো আমাদের শরীরের ভিতরে রয়ে যাবে। এরাই তারপর বংশবৃদ্ধি করবে এবং পরবর্তী জেনেরেশনের ব্যকটেরিয়ায় তাদের জীনই প্রবাহিত হবে (ব্যকটেরিয়া কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করে)। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যাবে যে সেই রোগী আবার নতুন করে অনেক বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং এইবার আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ওষুধেও আর কাজ হচ্ছে না। প্রথমবার সবটুকু ওষুধ খেলে হয়ত সবগুলো ব্যকটেরিয়াকে মেরে ফেলা সম্ভব হোত, এখন হঠাৎ করে ওষুধটা খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার ফলে শুধুমাত্র ওষুধ প্রতিরোধকারী শক্তিশালী ব্যকটেরিয়াগুলোকে বাচিয়ে রাখা হলো।

একই পরিনতি লক্ষ্য করা যায় যখন ফ্লু বা ঠান্ডা লাগলে আমরা ডাক্তারকে টেট্রাসাইক্লোন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য জোড়াজুড়ি করতে থাকি। ইনফ্লুয়েনজা বা ঠান্ডার কারণ ভাইরাস, ব্যকটেরিয়া নয়; আর অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র ব্যকেটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এর কোন ভুমিকাই নেই। ফ্লু বা ঠান্ডার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক তো কোন কাজে লাগেই না, বরং আমাদের শরীরের ভিতরের দুর্বল ব্যকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলে শক্তিশালী কিছু ব্যকটেরিয়াকে জিইয়ে রাখতে সহায়তা করে। তারপর ক্রমশঃ অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অনেক বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এই ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের শরীরে বংশবৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যতে অসুস্থ হলে আরও কড়া অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া কোন কাজ হয় না।

(**অনুবাদকের নোটঃ** বাংলাদেশের অনেক ডাক্তারই যে কোন অসুখের চিকিৎসায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে অ্যান্টিবায়োটিক এবং একাধিক ওষুধ দিয়ে থাকেন। যেনো ভাবটা হচ্ছে, একটা না একটা ওষুধ তো কাজে লাগবেই। কিন্তু এর ফলে রোগীর শরীরে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ভবিষ্যতে রোগ সারানোর জন্য অনেক কড়া ওষুধের প্রয়োজন হয়। এর ফলে, পরোক্ষভাবে রোগীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমে যায়।)

এখানে অবশ্য জোড় দিয়ে উল্লেখ করা দরকার যে, অ্যান্টিবায়োটিক নিজে ব্যকটেরিয়াকে শক্তিশালী করে না, বা সরাসরি ব্যকটেরিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায় না। অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে, মাইক্রো-বিবর্তনীয় পরিবর্তন (micro-evolutionary shift) এর মাধ্যমে, নতুন একধরনের ব্যকটেরিয়ার স্ট্রেইন তৈরীর পরিবেশ সৃষ্টি হতে সহায়তা করে। আমরা ব্যকটেরিয়া কলোনীর কোন কোন ব্যকটেরিয়ার মধ্যে ওষুধ প্রতিরোধ করার যে প্রবণতা লক্ষ্য করি তা বংশগত বা জেনেটিক মিউটেশনের মাধ্যমেই ঘটে, কোন ওষুধের প্রভাবে নয়। কিন্তু শুধুমাত্র ওষুধ প্রয়োগ করার পরই এদের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়, যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পর বেশীর ভাগ দুর্বল ব্যকেটেরিয়া মরে যায়, শুধুমাত্র শক্তিশালী ব্যকেটেরিয়াগুলোই অনেক বেশী হারে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

জেনেটিক মিউটেশন যে ওষুধের প্রভাব ছাড়াই ঘটে তা ইতিমধ্যেই ল্যবরেটরীতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমানিত হয়েছে। যখন অনেকগুলো ব্যকটেরিয়া কলোনীকে আলাদা আলাদা করে কালচার (culture) করা হয়, তখন দেখা যায় কোন কোন কলোনী ওষুধ প্রতিরোধক প্রবনতা প্রদর্শন করে যদিও তাদের উপর

কখনও কোন ওষুধ প্রয়োগ করা হয়নি। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে বেশীর ভাগ সময়ই আমাদের শরীরে এই ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যকটেরিয়ার উপস্থিতি দেখা যায় না এবং তার ফলেই অ্যন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে সব জীবানুকেই মেরে ফেলা সম্ভব হয়। খুব ছোট বংশবৃদ্ধির চক্র (cycle) এবং বিশাল জনসংখ্যা থাকার ফলে ব্যকটেরিয়া অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশী সুবিধা পেয়ে থাকে, এরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে খুব বিরূপ একটি পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অনেক বেশী সময় ও সুযোগ পেয়ে থাকে। দ্রুত বংশবৃদ্ধি এবং বড় জনসংখ্যার কারণে এদের মধ্যে মিউটাশনের ঘটে তুলনামুলকভাবে অনেক বেশী। এই দুটি কারণে খুব সহজেই ব্যকটেরিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে মিউটেশনের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়ে ওঠে।

একই রকম উদাহরন দেখা যায় জমিতে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও। বারবার একই ওষুধ জমিতে দিতে থাকলে বেশীরভাগ দূর্বল ব্যকটেরিয়া মরে যায় কিন্তু কীটনাশকের ক্রিয়া প্রতিরোধে সক্ষম আরও শক্তিশালী ব্যকেটেরিয়াগুলো রয়ে যায় বংশবৃদ্ধি করার জন্য। ব্যকটেরিয়ার মত জমির এই পোকাগুলোও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। অন্যদিকে ওষুধের কোম্পানীগুলোও দিন দিন আরও কড়া ওষুধ বের করতে থাকে এদেরকে দমন করার জন্য। এর ফলে একসময় দেখা যায় জমিতে খুব বেশী কড়া ওষুধ প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন কাজই হচ্ছে না।

শিল্প বিপ্লবের সময় পেপারড মথের বিবর্তন : বাতাস দুষনের মাধ্যমেও কি বিবর্তন ঘটা সম্ভব?

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরন দেখা যায় শিল্প বিপ্লবের আগে এবং পরে পেপারড মথের (ভসিতনৈ বতুেলারী) বিবর্তন থেকে। বৈজ্ঞানিকরা গত ১৪০ বছর ধরে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে পেপারড মথের এই প্ররিবর্তন পর্যবেক্ষন করে আসছেন। এই ইংলিশ মথ প্রজাতিটিকে হাল্কা এবং গাঢ়- দুটি রং এই দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু তারা একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, দুই রং এর মথের মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রজননও ঘটতে দেখা যায়। শুধুমাত্র এক জোড়া জীন (যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির সময় সন্তানেরা মা এবং বাবা প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি জীন পেয়ে থাকে) দিয়ে এদের গায়ের রং নির্ধারিত হয়। গাঢ় রং এর জীনটি হালকা রং এর জীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে (এর অর্থ হচ্ছে, যদি গায়ের রং নির্ধারণকারী জীনের জোড়ার মধ্যে একটি হাল্কা এবং একটি গাঢ় রং এর জীন থাকে তাহলে সন্তানের গায়ের রং গাঢ়ই হবে, হালকা রং এর জীনের বৈশিষ্ট্য এখানে ঢেকে যাবে। এক্ষেত্রে হাল্কা রং এর জীনটি recessive gene এবং গাঢ় রং এর জীনটি dominant gene হিসেবে কাজ করে)। এই মথগুলো সাধারণত লিচেন নামের একধরনের পরজীবি ছত্রাক দিয়ে ঢাকা গাছের ডালের উপর বিশ্রাম করে। ১৮৪৮ সালের জাদুঘরের এক সংগ্রহ থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ইংল্যান্ডের ম্যঞ্চেস্টার শহরে সেসময়ে গাঢ় রং এর মথের সংখ্যা ছিল শতকরা এক ভাগেরও কম। পাখীদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল এই পোকাগুলো, হাল্কা রং এর লিচেন দিয়ে ঘেড়া গাছের ডালগুলোতে বসে থাকা গাঢ় রং মথগুলো খুব সহজেই পাখিদের চোখে পরতো এবং তাদের শিকারে পরিনত হত। অন্যদিকে হাল্কা রং এর পোকাগুলো খুব সহজেই গাছের ডালের রং এর সাথে মিশে যাওয়ার ফলে তাদেরকে পাখিরা সহজে দেখতে পেত না, এবং তারা অনেক কম পরিমানে মারা পরতো। এর ফলশ্রুতিতে হাল্কা রং এর মথগুলোর সংখ্যা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেতো এবং তাদের জীন বংশপরম্পরায় অনেক বেশী পরিমানে বিস্তৃত হত।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে পরিবেশের অনেক পরিবর্তন ঘটে, কারখানা থেকে নির্গত ঝুল, ময়লা থেকে বাতাস অনেক বেশী দুষিত হয়ে পরে। এই পরিবেশ দুষনের কারণে গাছের ডালের উপর বাস করা লিচেনগুলো হয় মারা যেতে শুরু করে আর না হয় তাদের উপর একধরনের গাঢ় রং এর আস্তারন পরতে শুরু করে। এখন হাল্কা রং এর মথগুলো অনেক বেশী পরিমানে পাখিদের শিকারে পরিনত হয়। এই সময়ের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে শতকরা ৯৫ ভাগ পেপারড মথই ছিল গাঢ় রং বিশিষ্ট। কিন্তু এর পরপরই ইংল্যান্ডে বাতাসের দূষন রোধের আইন পাশ করানো হয় এবং এর ফলে বাতাসে দুষণও কমতে শুরু করে। আর বিবর্তনবাদ তত্ত্বের নিয়মানুযায়ী হাল্কা রং এর মথের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে শুরু করে। পাখিদের দ্বারা আরোপিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে সহজেই চোখে পরে এমন মথের সংখ্যা কমতে থাকে, এবং তার ফলে জীনের ফ্রিকোয়েনসি ও বদলে যেতে থাকে - যা আসলে বিবর্তেনরই অংশ। এখানে নতুন কোন প্রজাতি তৈরী (speciation) হয়নি, দুই রং এর মথই ছিল একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

>>>>> চলবে